কথাপ্রসঙ্গে

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং
ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্॥
চূড়ায়াং শিখিপিঞ্ছিনী তিলকিনী ভালেঽধরে বংশিনী
পীনাংসে বনমালিনী কটিতটে পীতাম্বরালম্বিনী।
পাদে নূপুরিণী তথা নয়নয়োঃ প্রেমামৃতাপাঙ্গিনী
লীলা কাচন বর্ততাং মনসি মে রাধা মনোমোহিনী॥

এই যুগলের আশীর্বাদ নিয়ে কথা আরম্ভ করছি। তিনি বলছেন—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার লীলা-বিষয়ক এই নাটকটি কজন পড়বেন, দেখবেন বা শুনবেন জানি না, কিন্তু মানটি আমাকে দিতেই হবে, কারণ শালগ্রাম শিলা যদি কুয়োর জলেও স্নান করানো যায়, তাহলেও সেই জল চরণামৃত হিসেবে খেতে হয়। ফলত আমার নাটক মানুষকে শুনতে হবে, গৌরব সেই পরমপুরুষের।

অতএব শ্রীরূপ গোস্বামীকে অনুকরণ করে আমিও বলব, আমি শ্রীভগবানের কথা বলতে প্রবৃত্ত হয়েছি বলে আমার কথাও আপনাদের শুনতে হবে।

প্রখ্যাত গবেষক-লেখকের প্রিয় বিষয় বৈষ্ণবদর্শন ও সাহিত্য।
কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিমার্গের আলোকে বেদ-উপনিষদ-পুরাণ ছুঁয়ে ভাগবত—
বৈঠকি মেজাজে গভীর তত্ত্বকথা শোনালেন
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি।

শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ, তিনটি নাটক লিখেছিলেন—বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, আর একটি নাটকোপম—'কেলিকৌমুদী'। একটি নাটকের প্রস্তাবনা অংশে

আমার মনে হয় আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময় কেটেছে আমার শৈশবে। ভোরবেলা থেকে শুরু হত কীর্তন। বিভিন্ন জায়গায় কীর্তন শুনতে গিয়েছি এবং কীর্তন করেওছি প্রচুর।

ভিক্ষাও করেছি। কী আনন্দ হয় যখন ভিক্ষার চাল প্রসাদ হিসেবে আসে! ছোটবেলায় অবশ্য প্রসাদের ওপর আকর্ষণ বেশি ছিল। বৈষ্ণববাড়িতে দেবতার ভোগ, বালকের পক্ষে অনন্ত যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়াত। ভোগের সময় দরজা বন্ধ হয়ে যেত—ভোগের আর কিছুই দেখা যেত না। বাইরে কীর্তন শুরু হত, শেষ আর হতই না। সেই যে আরম্ভ হল—''ভজ পতিতোদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপবিহারী দীনদয়াময় হিতকারী''—আর থামে না। তারপর ভোগদর্শন যখন হত, তখন আকাঙ্ক্ষা চলে গেছে। হয়তো এইটিই শিক্ষা ছিল যে, অত লোভ ভাল নয়। যাই হোক, সেই পরিবেশে বড় হয়েছি। সেই পরম্পরাকৃত ভাবনা থেকেই দু-চার কথা বলব।

ভারতীয় শাস্ত্রে চারটি পুরুষার্থ নির্দেশ করা হয়েছে—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য তিনটি মার্গ নির্দিষ্ট হয়েছে—কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ। যাগযজ্ঞের ভাবনা থেকে কর্মমার্গ তৈরি হয়েছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ ছিল কৃচ্ছ্রসাধ্য। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐহিক ও পারত্রিক সুখ। এখানে এসেছে বহুদেববাদ—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। সেই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না : ''এক দেবতা আমার চিতে/ চাইনি তোমায় খবর দিতে/ আরো আছেন তিরিশ কোটি।''

তিরিশ কোটি বা তেত্রিশ কোটি না হোক, তেত্রিশ জন দেবতা তো ছিলেনই। যখন যাঁকে সন্তুষ্ট করা হচ্ছে তখন তাঁকেই 'supreme' বলে স্তুতি করা হচ্ছে। দেবতার সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে—আমি তোমাকে পুরোডাশ, সোম ইত্যাদি দিচ্ছি; তুমি আমাকে এই-এই দাও। দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্ন অবশ্য এসেই যায়—দেবতার প্রীতি উৎপাদন করার জন্য যেন কিছু দিতেই হবে! বৈদিক ঋষি জানেন যে 'Everything is fine'; যদ্ বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ ভদ্রম্—মানুষের যদি অর্থ থাকে সেটা বেশ; গৃহা ভদ্রম্—যদি একখানা বাড়ি থাকে তো বেশ; পশবো ভদ্রম্—পশু যদি থাকে সেও বেশ; প্রজা ভদ্রম্—প্রচুর ছেলেপুলে থাকলে তাও বেশ।

এই যে দেওয়া-নেওয়াটা আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে রয়ে গেল, আজ পর্যন্ত আমরা ভগবানকে ভগবানের জন্যই চাই না—আমরা চাই আমাকে এই দাও, ওই দাও। মহালয়ার ভোরে একই প্রার্থনা : রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। এ-প্রার্থনার কোনও শেষ নেই।

পণ্ডিতেরা গবেষণা করে বলেছেন, চাইতে চাইতে বৈদিক মানুষদের মধ্যে একটা ক্লান্তি এল। অনেক চাওয়া, অনেক পাওয়া তো ভাল নয়! আমাকে যদি অনন্তকাল ধরে শুধু রসগোল্লাই খাওয়ানো যায়, তাহলে আমি রসগোল্লা আর খেতে চাইব না। কাজেই অনেক চাওয়া-পাওয়ার পর একধরনের ক্লান্তি ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে ধরা পড়ল। পণ্ডিতেরা—তাঁদের তো শকুনের মতো চক্ষু—তাঁরা দেখলেন আর বুঝলেন যে, ওইটি এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ আর চাইছে না। ঠিক এখনকার বাচ্চাদের মতো—তারা এত খাবার, খেলনা, জামাকাপড় পায় যে তারা আর কিছুই চায় না। যাই হোক, বৈদিক ঋষিদের ওই 'ক্লান্তি'টা পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—এই মন্ত্র থেকে। তাঁদের মনোভাব—আমরা এতকাল ধরে এত পুরোডাশ, এত আজ্য আহুতি দিয়েছি, এখন মনে হচ্ছে কোন দেবতাকে আর হবি দিয়ে তুষ্ট করব?

পণ্ডিতেরা বলছেন, ''This is the turning point from Karmayoga to Jnanayoga.'' আর চাওয়া নয়—নিজেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তিনিই আমি—এভাবে চিনতে হবে। নিজেকে চেনার রাস্তা অত সহজ নয়। প্রথমত 'সমিৎপাণি' হয়ে গুরুর কাছে যেতে হবে। আবার তিনি যা

বলবেন সেও বোঝা কঠিন। বৈরাগ্য অবলম্বন করে সে-উপদেশ শুনতে হবে। সে হল ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্ম বস্তুটিকেই বোঝানোর চেষ্টা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার—এত অনির্বচনীয়! কারণ তিনি সমস্ত বৈপরীত্যের সমাহার। তিনি বিরাটের থেকেও বিরাট, আবার অণুর থেকেও অণু। আবার তিনি এটাও নন, তিনি ওটাও নন। উপনিষদে এক্ষেত্রে 'তৎ'—'সেই' বা 'তিনি' শব্দটিই বেশি আসে। যখনই আমি 'তৎ' কে বা কী তা বোঝার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছি তখনই উপনিষদ বললেন, 'তন্ন'—তিনি নন। সেই থেকে বাংলা ভাষায় 'তন্ন তন্ন' করে খোঁজাটাও আরম্ভ হয়ে গেল। তৎ ন তন্ন, মানে এটা নয়, এটা নয়। তাহলে কোনটা?

মনশ্চক্ষুরাদের্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো
মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽয়মাত্মা॥

—যিনি সমস্ত মন, চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের থেকে বিমুক্ত, কিন্তু তিনি সমস্ত মন, চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়েরও মন, চক্ষু ইন্দ্রিয়। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগম্য তিনি, নিত্য উপলব্ধিস্বরূপ।

তাহলে অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে যাকে মনের মধ্যে অনুভব করতে হবে, তাকে চেনার উপায় কী? চেনার উপায় কিছুই নেই, যদি না তিনি ধরা দেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

এইভাবে যদি খুঁজতেই থাকি যে আমি কে, তাহলে একসময় নিশ্চয়ই বুঝব—এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আমি নই, কারণ এগুলো মরণশীল। এই আমার গৃহ, এগুলো পতনশীল। আমিও থাকব না, দুদিন পর এর কী গতি হবে তাও জানি না। এবং এও ভাবার কোনও কারণ নেই যে আমাদের মধ্যে যে-সমস্ত অন্যায়, পাপ বা ভাল আছে তার কোনওটাই তিনি নন।

দুঃখে পড়ে অনেকে বলে—ভগবান কেন আমাকে এরকম করলেন? সুখের সময় কিন্তু কখনও কৃতজ্ঞতাবোধ করে না।

গীতা বলছেন—নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ—আত্মা কাউকে পাপও দেন না, কাউকে পুণ্যও দেন না; অথবা কারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। মাণ্ডূক্য উপনিষদও বলেছেন, 'পুণ্যপাপে বিধূয়' অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ উভয়ই দূর করতে হবে। পাপের ফল যেমন বন্ধন সৃষ্টি করে, পুণ্যের ফলও তেমনি বন্ধন সৃষ্টি করে। তার জন্য ভগবানের কোনও দায় নেই।

তাঁকে অনুভব করার মধ্যে সর্বোচ্চ আনন্দ আছে। যখন তুমি বুঝবে যে তুমিই তিনি, তখন এই সমগ্র বিশ্বজগৎ তোমার কাছে আপন হয়ে যাবে। সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু-প্রাণীর মধ্যে তুমি নিজেকে দেখতে পাবে এবং তোমার মধ্যে অন্য সমস্ত কিছুকে দেখতে পাবে। নিজের মধ্যে অন্যকে দেখা এবং অন্যের মধ্যে নিজেকে দেখা—এইটিই চরম প্রাপ্তি ব্রহ্মজ্ঞানীর। এই-ই নিজেকে চেনা।

তিনি যদি কোনওটিই না হন, তাহলে দাঁড়ায় যে তিনি নেই। তা নয়। তিনি এটা নন, ওটা নন বটে, তার মানে তিনি সব। বস্তুস্বরূপ তিনি নন—কাঠমাত্র বা আমার দেহমাত্র তিনি নন, কিন্তু আবার কাঠও বটে, আমিও বটে।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের এই পথ বড়ই কঠিন। ক্রমশ বোঝা গেল, এমন কিছু চাই যার মধ্যে পরব্রহ্মের জ্যোতির আবেশ আছে, আবার তার একটা চেহারাও আছে। ঋষিরা তেমন একটা প্রেসক্রিপশন দিলেন। উপনিষদে দুরকম কথাই আছে। 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, আবার বলা হয়েছে তিনি 'এষ আত্মা সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ যেন এমন একটা ব্যবস্থা করা হল যাতে তিনিও alone feel না করেন এবং আমরাও alone feel না করি। আমরা যেন দরকারমতো তাঁকে আমাদের কথা জানাতে

পারি, তাঁর স্পর্শ পেতে পারি। বলা হয়েছে, এই সমস্যা শুধু আমাদের নয়, এই সমস্যা স্বয়ং ভগবানেরও হয়েছে। দ্বৈতবাদীরা বলবেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা বহু জ্ঞানচর্চার পর, বহু সাধনের পরই সম্ভব। অবশিষ্ট মানুষের কী হবে? তাহলে তো অখিলরসস্বরূপ ভগবান শুধুমাত্র দার্শনিকদের ভগবান হয়েই রইলেন!

শাস্ত্রকারেরা এর উত্তর দিয়েছেন। উপনিষদে এই বাক্য আছে—স বৈ নৈব রেমে। অর্থাৎ, তাঁর ভাল লাগছিল না। কেন?—যস্মাদ্ একাকী ন রমতে—যেহেতু একা একা ভাল লাগে না। বড় সত্য কথা। আপনি যদি হিমালয়েও যান, তাহলেও 'এটি খুব সুন্দর' বলার জন্য আপনার একজন সঙ্গী লাগবে।

স্বাদু বস্তু একা ভোগ করা যায় না। মহাভারতে বিদুর উপদেশ দিচ্ছেন—একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত—একা একা স্বাদু জিনিস আহার কোরো না, তাতে স্বাদ বোঝা যায় না।

'স্বাদ' কথাটির মানে কী? স্ব মানে নিজে, আর অদ্ ধাতুর মানে খাওয়া। স্বম্ অত্তি—আমি যখন নিজেকে খাই, তখনই আমি খাবারের স্বাদ বুঝি। খুব কঠিন কথা। নিজেকে খাই কীভাবে? ধরুন, কিছু খাওয়ার পর যে-রসাস্বাদন হল সেটি মনের মধ্যে গেল, তারপর বুদ্ধিগত হল। তখন আপনি বুঝলেন যে আপনি কিছু আস্বাদন করেছেন। এভাবে আপনি নিজেকেই আস্বাদন করলেন। বৃহদারণ্যক বলছেন—ন বা অরে গার্গি পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। আমি যে আমার ছেলেকে ভালবাসি তা ছেলের জন্য নয়। আসলে আমি নিজেকেই ভালবাসি। ছেলেকে ভালবাসতে আমার ভাল লাগছে বলেই আমি ভালবাসি। ছেলে একটা image মাত্র। তার হিতের জন্য ভাবাটাও একান্ত আমারই, আমার ভাল লাগে বলেই ভাবি। এমন সময়ও তো আসে, যখন ছেলে চায় না আমার ভালবাসা। বলি—ওরে খেতে দেব? ছেলে হয়তো তখন একেবারেই খেতে চাইছে না, হয়তো রেগেই গেল। তবু যে বলছি, তার কারণ আমি আমাকেই তুষ্ট করছি। আমিই স্বাদগ্রহণ করছি।

স্বাদ মানে এই। যেটা আমার ভাল লাগছে, সেটা সত্যিই ভাল কি না তা বুঝতে আর একজনকে চাই। আমি যে সুন্দর সেটা বুঝতে একটা আয়না লাগে। আমি অন্যের মধ্যে গুণ ছড়িয়ে তবে বুঝতে পারি যে আমি গুণী। তার মানে আমি একা একা কিছুই পারি না। সুতরাং আমাকে আস্বাদন করার জন্য আমার একটা আয়নার দরকার আছে।

তাই, একা-একা ভাল লাগছিল না বলে, ব্রহ্ম কী করলেন? 'জায়া চ পতিশ্চ'—জায়া আর পতি হলেন। রূপ গোস্বামীর নাটকে রয়েছে, মথুরায় থাকাকালীন শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই পূর্বজীবন সম্পর্কিত একটা নাটক দেখে বললেন, তিনি নিজে কত ভাল সেটা বোঝার জন্য তাঁর রাধা হতে ইচ্ছা করছে। তিনি জলে নিজের ছায়া দেখে বলছেন—অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী—আমি এত সুন্দর? তার মানে কৃষ্ণকে বোঝার জন্য একটা দ্বিতীয় স্বরূপতা চাই। নিজেকে সুন্দর বলে বুঝতেও সরোবরের নিথর জল লাগে। অর্থাৎ একটি দ্বিতীয় বস্তু লাগে।

ফিরে আসি ঋষিদের প্রেসক্রিপশনের কথায়। এমন একটি শাস্ত্র চাই যাতে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাও আছেন, আবার তিনি অনির্বচনীয় নন—তাঁকে দেখা যাবে, বোঝা যাবে, স্পর্শ করাও যাবে। এই আস্বাদনযোগ্যতাই ভাগবতপুরাণের মূল কথা। অর্থাৎ ভগবানকে এখানে আমরা আস্বাদন করতে পারছি, নিজের করে পেতে পারছি। এই হল তৃতীয় পথ—ভক্তিমার্গ। কর্মমার্গ থেকে পেলাম বৈদিক দেবতাদের, তার নির্যাস উপনিষদে রয়েছেন ব্রহ্ম, আবার ভাগবতে এসে দেখলাম তিনিই সেই উপনিষদ-উক্ত চরম-পরম হয়ে আছেন, উপরন্তু

তাঁর সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

এখানেই ভাগবতদর্শনের আরম্ভ। যিনি 'অখিলরসামৃতমূর্তি' তিনি অবতার হলেন। তিনি ধরাধামে নেমে এলেন। অবতারদের মধ্যেও একটা ব্যাপার আছে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ অবতার শুধু ভূভারহরণ করছেন। অবতার হওয়ার 'primary motive' গীতায় বলা হয়েছে ভূভারহরণ (বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্), অর্থাৎ পৃথিবীতে যাতে অশুভশক্তি আর না থাকে। প্রথম মনুষ্যমূর্তি হলেন—তাও অবশ্য পূর্ণমানব নন—নৃসিংহ অবতার। উপনিষদের ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব নৃসিংহ অবতারের মধ্যে 'projected' হয়েছে। হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ভগবান এই এই জায়গায় আছেন?—আছেন।—এই স্তম্ভের মধ্যেও আছেন?—আছেন।

তিনি যে সর্বব্যাপী এটা বোঝানোর জন্য সেই স্তম্ভ ভেঙে তিনি এলেন। দুষ্টের (হিরণ্যকশিপুর) দমন এবং শিষ্টের (প্রহ্লাদের) পালনের জন্য এলেন—যেটা তাঁর 'primary motive of incarnation'। আমরা দেখলাম নৃসিংহ অবতারকে কেউ তুষ্ট করতে পারছে না। দেবতারা পারছেন না, স্বয়ং লক্ষ্মীও নন। সিংহের রাগ, বিক্রম ক্রমশ বাড়ছে, পৃথিবী রসাতলে যায়-যায়। এমন সময় দেবতারা ভক্ত প্রহ্লাদকেই ধরলেন তাঁকে শান্ত করার জন্য। ওই অবস্থায় প্রহ্লাদ স্তব করছেন এবং তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের সিংহমুখের জিহ্বাতে প্রহ্লাদের গাল চেটে দিচ্ছেন নৃসিংহদেব—এই স্থানটিতে আমরা প্রথম ঈশ্বরের করুণা-ভালবাসার স্পর্শ পাই।

এই করুণা বাড়ল বামনরূপে। বামন হয়ে তিনি বলিকে বদ্ধ করলেন। বলির কাছে ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা চেয়েছিলেন তিনি। প্রথম পদক্ষেপে সমস্ত স্বর্গ, দ্বিতীয় পদক্ষেপে অন্তরিক্ষ-মর্ত্য-পাতাল ভরে গেল। বললেন—তৃতীয় পদক্ষেপ কোথায় করব? বলি উত্তর করলেন—পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে স্থিতম্—আমার মাথায় আপনি তৃতীয় পদ রাখুন।

আজ পর্যন্ত সেই তৃতীয় পদের স্মরণ আমরা পূজার প্রারম্ভে করে থাকি—ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ/ দিবীব চক্ষুরাততম্। এই সেই তৃতীয় পদ—ত্রিভির্বিষ্ণুঃ বিচক্রমে—যে-তৃতীয় পদে তিনি বলির মস্তক আবরণ করলেন। স্বীকার করলেন, পাতালে তিনি বলির দ্বাররক্ষী হবেন। এটা শুধুমাত্র শাসন হল না। শাসন যাকে করছেন তার তিনি দ্বাররক্ষী হয়ে থাকলেন। বলির ভক্তিতে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। এইটিই ভাগবতের একটি বৈশিষ্ট্য—ভক্তের ভক্তিতে ভগবানের বাঁধা পড়া।

প্রসঙ্গত বলি, কৃষ্ণবিষয়ক নাটক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি ভক্তিসম্পর্কে আমার এক মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, ধ্বন্যালোক প্রভৃতির রচয়িতারা আটটার বেশি রস নাটকে স্বীকার করেননি বটে,—তার সঙ্গে বড়জোর টেনেটুনে শান্তরসটিকে মেনেছেন—তবু তাঁদের নিজেদের লেখায় কোথাও কোথাও ভক্তিরস দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আনন্দবর্ধন একটি শ্লোকে লিখছেন, কবিরা প্রতিভাবলে এই বিশ্বের বর্ণনা করেছেন এবং আমরা যারা সহৃদয় তারা সেইসব আস্বাদন করছি। কিন্তু—নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং শ্রান্তা নৈব লব্ধমবধিশয়নস্ত্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্—তোমার ভক্তির তুল্য সুখ কখনও পাইনি।

অন্যপ্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আনন্দবর্ধন। এক শিবভক্তের শিবত্বপ্রাপ্তি হয়েছে অর্থাৎ 'আমিই তিনি' এই বোধ হয়েছে। জাগতিক কোনওকিছুর প্রয়োজন আর তাঁর নেই। তাঁর জবানিতে এই শ্লোকটি—

ভস্মোদ্ধূলন ভদ্রমস্তু ভবতে রুদ্রাক্ষমালে শুভং/
হা সোপানপরম্পরা গিরিসুতাকান্তালয়ালঙ্কৃতিঃ

ইত্যাদি। মাস্টারমশাইয়ের বক্তব্য, এই 'হা' শব্দটির

মধ্যেই সব আছে। গিরিসুতাকান্ত অর্থাৎ শিবের আলয় বা মন্দিরের অলংকারস্বরূপ যে-সোপানশ্রেণি সেটি প্রতিদিন ভক্ত মুছতেন, আজ থেকে আর এসব করতে হবে না। ভস্মতিলক, রুদ্রাক্ষমালা—কিছুরই প্রয়োজন নেই। কিন্তু সোপান মুছতে না পারার বেদনা ওই 'হা' শব্দটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। ওতেই যথার্থ ভক্তিরস। ভক্ত শিবত্ব লাভ করেছেন কিন্তু শিবের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি ক্ষুণ্ণ।

তার মানে আস্বাদন করার জন্য একটু আলাদা হয়েই থাকা ভাল। রামপ্রসাদও গেয়েছেন : চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি। কাজেই আস্বাদন যদি করতে হয় তাহলে একাকার হয়ে গেলে হবে না, duality লাগবে। এইখানেই অবতারবাদের চরম জায়গায় এসেছে শ্রীকৃষ্ণের কথা। তাঁর কথা অত্যন্ত মধুর :

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ/...
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো।

এই যে মধুর মূর্তিতে তিনি নেমে এলেন, কতজন মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল! নন্দ, গোপ, যশোমতী, রাধা...! অখিলরসামৃতসিন্ধু যখন ধরা দেন তখন সাত-আটটি রসের বিষয় হন তিনি। কৃষ্ণকে ধরলে আমাদের আস্বাদনের পরিপূর্তি বহুভাবে। যশোদার কথা ভাগবতে বলা হয়েছে :

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী
কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি।

কৃষ্ণ আমার এই করেছে, ওই করেছে—এই গান গাইতে গাইতে তিনি দধিমন্থন করতে লাগলেন। দাসীদের অন্য কাজে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কৃষ্ণের খাবারটি স্বহস্তে করবেন।

আমার তো মনে হয় ভাগবত ভীষণভাবে 'মডার্ন'। মাতৃত্বের বোধ কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন! মায়েরা নিজের ছেলের কথা বলতে ভালবাসেন। এক মায়ের কাছে তাঁর ছেলের কথা শুনতে শুনতে অন্য মা বিরক্তি বোধ করেন, কিন্তু তিনি নিজে যখন বলতে আরম্ভ করেন তখন তাঁরও বোধ থাকে না যে তিনিও তাঁর ছেলের কথাই বলছেন। মাতৃত্বের এই স্বরূপ।

পরে একজায়গায় রয়েছে, যশোদা কৃষ্ণকে বেঁধে রাখতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না। যতই দড়ি যোগ করুন না কেন—তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং—সবসময় দু-আঙুল দড়ি কম পড়ছে। কৃষ্ণ যখন দেখলেন মায়ের এত কষ্ট হচ্ছে, তখন তিনি নিজেই বন্ধনের মধ্যে ধরা দিলেন। বন্ধনের মধ্যে ঈশ্বরের এই ধরা দেওয়াই ভাগবত দর্শন।

ভাগবতের চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মার মুখে একটি সুন্দর শ্লোক আছে :

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥

—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বন্দনার যোগ্য একমাত্র আপনিই। আমি আপনার চরণে প্রণতি জানাচ্ছি। নবীননীরদশ্যামল আপনার দেহ, তাতে স্থির সৌদামিনীর মতো শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল পীত বসন। গুঞ্জামালা, কুণ্ডল, ময়ূরপুচ্ছের দীপ্তিতে আপনার আনন উদ্‌ভাসিত। বক্ষে বনমালা, হাতে অন্নের গ্রাস, কক্ষে বেত ও শিঙা, কটিবন্ধনীতে বাঁশরী, যা যা আপনার অঙ্গসঙ্গ লাভ করেছে—সবকিছুর মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে অসীম সৌন্দর্যের দ্যুতি। কমল-কোমল চরণদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করে বিরাজ করছেন আপনি গোপবালকের মনোহর বেশে!

এই যে তাঁর হাতে পাঁচনি গোরু চরাবার জন্য, মাথায় শিখিপাখা—এত সাধারণ বেশ এইজন্য যে, এতে আমরা তাঁকে খুব কাছে পাই। নিজের মতো করে আস্বাদন করতে পারি। সেই আস্বাদ কোন শিখরে উঠতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে আছেন, জগন্নাথ দর্শন করে একটি শ্লোক উচ্চারণ করলেন :

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি চৌর্যসুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে॥

—যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন তিনিই আমার স্বামী হয়েছেন, সেই চৈত্ররজনী, সেই মালতীর গন্ধ যা কদম্বের উপর দিয়ে ভেসে আসছে, সেই আমিও আছি। তথাপি রেবানদীর তীরে বেতসীতরুর তলে যে-গোপন মিলন হত, তারই জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছে।

নরনারীর বিষয় সম্পর্কিত এই প্রাকৃত শ্লোকটি মহাপ্রভু উচ্চারণ করলেন কেন? সকলের মনে এই প্রশ্ন উঠল—সবে কহে প্রাকৃত শ্লোক কেনে উচ্চারিল। সবাই এরকম বলাতে, চৈতন্যদেবের জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী মনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি উক্ত শ্লোকের গূঢ়ার্থ অপর একটি শ্লোকে নিবদ্ধ করে, তালপাতাটি কুটিরের চালে শুকোতে দিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে গেলেন। মহাপ্রভু ইতিমধ্যে এসে সেই শ্লোকটি দেখলেন :

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

কুরুক্ষেত্রে (বুঝতেই পারছেন, যুযুৎসুরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন) একদা রাধারানির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেখা হয়েছিল। শ্রীরাধা কৃষ্ণদর্শনের পর প্রিয়সখীকে বললেন—কুরুক্ষেত্রে সেই প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গে আমার দেখা হল, আমিও সেই রাধাই আছি। আমাদের মিলনসুখও সেই একই আছে। তবু যমুনাতীরের সেই যে বনে বাঁশরীর পঞ্চম সুরের মধুর সুরলহরী জেগে উঠত তারই জন্য আমার মন কেমন করছে।

শ্লোকটির নিহিতার্থ কী?—ঐশ্বর্যমূর্তিতে আছেন জগন্নাথ, ঐশ্বর্যের ক্ষেত্র পুরীধামে কত ক্ষমতা তাঁর! তিনি বনমালাধারী কৃষ্ণ নন, স্থানটিও যমুনাপুলিনস্থ বৃন্দাবন নয়। জগন্নাথের সঙ্গে রাধাস্বরূপে থাকা চৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন হল। কিন্তু এ-ঐশ্বর্যভূমিতে মিলন তাঁকে তৃপ্তি দিল না।

কৃষ্ণের গোপবালকবেশ, নটবরবেশ আমাদের এত প্রিয় যে, তাঁর মাথায় মুকুট চড়ালে আমাদের আর ভাল লাগে না। অতএব অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত রসের পরাকাষ্ঠা। ✠

লেখক-লেখিকার প্রতি

* নিবোধত পত্রিকার জন্য যে-লেখাটি পাঠাতে চলেছেন তার একটি হুবহু নকল অবশ্যই নিজের কাছে রাখবেন। **পাণ্ডুলিপি (মনোনীত বা অমনোনীত) ফেরত দেওয়া হয় না।**
* পাঠানো প্রবন্ধের সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করবেন।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না। লেখা ১৫০০ থেকে ২০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধারাবাহিক রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হবে।
* **মনোনয়ন, প্রকাশ এবং সম্পাদনায় সম্পাদনাবিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।** আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।